Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আখি আক্তার

রোলঃ 216022309

১৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আখি আক্তার

রোলঃ 216022309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আখি আক্তার, আইডিঃ 216022309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

.

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Akhi Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৯ মে, ২০২৪ ইং

আখি আক্তার

আইডিঃ 216022309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

“সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত”

“সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত”

ভূমিকা :

কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা‘আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

বিগত শরী‘আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী‘আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [ابراهيم: ٤٠]

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا﴾ [مريم: ٣١]

“এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ٥٥﴾ [مريم: ٥٥]

“সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

“মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া”। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর‘ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: ١٠٣]

“নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

তিনি আরো বলেন,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।" (সুনান তিরমিযী)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।"

উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে। আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন:

«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة»

"সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত"। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন সালাত তখন যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" (ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত)

যেভাবে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়:

নবীজি (সা.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়তি জীবনের অন্যতম অলৌকিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো মেরাজ। মহিমান্বিত এ রাতে মহানবী (সা.) সাত আসমান, আরশে আজিম, জান্নাত-জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন, আল্লাহর দিদারের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং উম্মতের জন্য নিয়ে আসেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশসহ ইসলামী সমাজ পরিচালনার বিধি-বিধান। পবিত্র কোরআনের সুরা বাণী ইসরাইলে আল্লাহ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

শবে মেরাজে ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহর দিদারের সৌভাগ্য শেষে উম্মতর জন্য উপহার স্বরূপ নামাজ নিয়ে ফিরে আসেন নবীজি (সা.)। তখন থেকে দিনরাতে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে ৫০ ওয়াক্ত সালাতের এ হাদিয়া নিয়ে ফেরত আসছিলেন; এর মধ্যে দেখা হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কী দিয়েছেন? নবীজি বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনার আগে আমি উম্মত চালিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কমিয়ে আনেন।

নবীজি সে মতে আল্লাহর কাছে গিয়ে কম করে দেওয়ার দরখাস্ত করলেন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। নবীজি তা নিয়ে ফেরত আসছিলেন। আবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে দেখা হলো। বললেন, আপনার উম্মত তা পারবে না। আপনি আরো কমিয়ে আনুন। নবীজি আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে আগের মতো দরখাস্ত করে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন। নবীজি বলেন, এভাবে আমি আল্লাহ ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকি। শেষবার আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ! এই হলো দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। প্রত্যেক নামাজের বিনিময়ে দশ নামাজের সাওয়াব। এভাবে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবে। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করতে পারবে না, তার জন্যও নেকি রয়েছে; এক নেকি। আর যদি ভালো কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশ নেকী। আর কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না। তবে তা করে বসলে একটি গুনাহ লেখা হবে।

নবীজি এ সওগাত নিয়ে ফেরত আসছিলেন। হযরত মূসার সাথে দেখা হলো। মূসা আ. এবার শুনে বললেন, আপনি যান, আরো কমিয়ে আনুন। আপনার উম্মত পারবে না। বনী ইসরাঈলের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। নবীজি বললেন, আমার আর কিছু বলতে লজ্জা হচ্ছে! (বুখারি, হাদিস: ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস: ১৬২, ১৬৪)।

সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান:

সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব। (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের "সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান" নামক রিসালা থেকে সংকলিত)

(খ) সালাত পরিত্যাগকারীর পরকালীন বিধান:

(১) বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: "তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।

(২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفٍ»

"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣]

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم: ٥٩]

“তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই “গাইয়া” প্রত্যক্ষ করবে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯] আপনি কি জানেন “গাইয়া” কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসীর ইবন কাসীর)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]
আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]
এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)
পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ﴾ [البقرة: ٤٥]

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, "নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আ্যলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

“অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, “যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও”। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج: ١٩، ٢٣]

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ»

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ

তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

সালাতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

সালাতের সংজ্ঞা

আল কুরআনে দেখা যায়, *সালাত* করা, *সালাত কায়েম* করা, *সালাত কায়েমের* জন্য পরিচ্ছন্ন হওয়া, *সালাত হেফাযত* করা, *সালাতের* উপর *দায়েম* (প্রতিষ্ঠিত) থাকা, *সালাতের আমর* ও *নাহি* (আদেশ ও নিষেধ), *ক্বিয়ামের* (দাঁড়ানোর) মাধ্যমে *সালাত* শুরু ও *সাজদাহর* (প্রণিপাতের) মাধ্যমে শেষ করা, *ইয়াওমুল জুমআতে* (জমায়েতের দিনে) *সালাতের* জন্য *নিদা* / আহবান করা, *সালাতে খাশিয়ূন* (বিনীত) হওয়া, *সালাতের* ব্যাপারে *ছাহূন* (উদাসীন) না হওয়া, *সালাতে* যা বলা হয় তা বুঝার মত মানসিক স্তরে না থাকা অবস্থায় সালাতের কাছে না যাওয়া, সালাতে মধ্যম স্বর অবলম্বন করা, ভয়ের অবস্থায় *সফরে* সালাতে *ক্বসর* (সংক্ষিপ্ত/ অদীর্ঘায়িত) করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সহ রসূলের ব্যাপারে আল্লাহর ও ফেরেশতাদের *সালাত*, মু’মিনদের ব্যাপারে আল্লাহর ও ফেরেশতাদের *সালাত*, রসূলের ব্যাপারে মু’মিনদের *সালাত*, মু’মিনদের ব্যাপারে রসূলের *সালাত*, মু’মিনের মৃত্যুর পর তার ব্যাপারে অন্য মু’মিনদের *সালাত* ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।

এর মধ্যে ৭৫:৩১-৩২ আয়াতে *সালাত* শব্দের কুরআনিক প্রায়োগিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যায়।

৭৫:২৯-৩২ :: এবং এক পায়ের গোছার সাথে আরেক পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। তোমার প্রভুর দিকেই সেদিন চালিয়ে নেয়া হবে। অথচ সে সত্যতা প্রতিপাদন করেনি এবং *সালাত* করেনি। কিন্তু সে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।

৭৫:৩১-৩২ আয়াতে *‘সদ্দাক্বা’* ও *‘সল্লা’* শব্দদ্বয়ের বিপরীত শব্দ হিসাবে যথাক্রমে *‘কাযযাবা’* ও *‘তাওয়াল্লা’* শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ *‘সদ্দাক্বা’* শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে *‘কাযযাবা’* এবং *‘সল্লা’* শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে *‘তাওয়াল্লা’*। *‘সদ্দাকা’* অর্থ ‘সত্যতা প্রতিপাদন করা’, *‘কাযযাবা’* অর্থ ‘মিথ্যা সাব্যস্ত করা’। *‘তাওয়াল্লা’* অর্থ ‘বিপরীতক্রমে বা বিমুখ হয়ে ফিরে যাওয়া’। সুতরাং *‘সল্লা’* হচ্ছে ‘অভিমুখী হয়ে এগিয়ে আসা’। অন্য কথায় বলা যায়, *‘তাওয়াল্লা’* হচ্ছে ‘প্রতিকূলতা’ এবং *‘সল্লা’* হচ্ছে ‘অনুকূলতা বা আনুকূল্য করা’। বিশেষ করে ৪:৮৮-৮৯ আয়াতের মধ্যকার ৪:৮৯ আয়াতে ব্যবহৃত *‘তাওয়াল্লাও’* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘জিঘাংসামূলক চরম প্রতিকূলে অবস্থান নেয়ার’ অর্থে। সুতরাং *‘সল্লা’* মানেও ‘ইতিবাচক কর্মসূচীসম্পন্ন অনুকূলতা’ হওয়াই স্বত:সিদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়। *‘তাওয়াল্লা’* অর্থ হলো: সঠিক জীবনব্যবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে প্রতিকূলতামূলক কর্মসূচীর সর্বাত্মক বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকা। এবং *‘সল্লা’* অর্থ হলো: সঠিক জীবনব্যবস্থার প্রতি অনুকূলতা বা ইতিবাচক সংযোগ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম করা।

প্রশ্ন হচ্ছে আয়াত দুটিতে *সদ্দাকা, কাযযাবা, সল্লা* ও *তাওয়াল্লা* বলতে কার বা কিসের প্রতি সত্যতা প্রতিপাদন করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আনুকূল্য করা বা প্রতিকূলে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে? বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট যে, এখানে গ্রহণীয় জীবনব্যবস্থার প্রতি সত্যতা প্রতিপাদন করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আনুকূল্য করা বা প্রতিকূলে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি সালাতের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিসত্তার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং তার আগে *‘আলা’* অব্যয়টি যুক্ত করা হয়।

সেই সাথে কুরআনে যেভাবে *সালাতের* শর্ত, সময়, পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ কথা স্পষ্ট যে, *সালাতের* একটি আনুষ্ঠানিক রূপও বিদ্যমান রয়েছে যা নিয়মিতভাবে দ্বীনের নিবিড় অনুসরণের প্রতীকী কর্মসূচীরূপে সম্পাদিতব্য। অর্থাৎ *সালাতের* দুটি ধরন রয়েছে, যথাঃ আনুষ্ঠানিক *সালাত* এবং বাস্তব *সালাত* তথা আনুষ্ঠানিক *সালাতের* শিক্ষা বাস্তবায়ন। সুতরাং *সালাতের* সংজ্ঞা হলো, গ্রহণীয় জীবনব্যবস্থার প্রতি আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব অনুকূলতামূলক কর্মসূচী সম্পাদন করা।

বস্তুত *‘সালাত’* হলো ‘কারো দিকে বা কোনো ব্যবস্থার দিকে ইতিবাচকভাবে অগ্রসর হওয়া’। এবং *‘তাওয়াল্লা’* হলো ‘কারো থেকে বা কোনো ব্যবস্থার থেকে নেতিবাচকভাবে মুখ ফিরানো বা মুখ ফিরিয়ে নেয়া’। যখন *‘আলা’* শব্দ যোগে সালাত করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হলো ‘কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা, কারো অনুকূলে অবস্থান নেয়া, কারো প্রতি সংযোগ রক্ষামূলক কর্ম সম্পাদন করা’।

২০:১৪ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর *যিকিরের* বা স্মরণের অনুশীলনের জন্য *সালাত* প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ৬২:১০ আয়াত অনুযায়ী সালাত *কাযা* বা যথানিয়মে সম্পাদনের পরে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে, আল্লাহর *ফযল* বা অনুগ্রহ তালাশ (তথা জীবিকা উপার্জন, শিক্ষাচর্চা ইত্যাদি) করতে হবে এবং তাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর *যিকির* বা স্মরণ করতে হবে।

সুতরাং একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি হিসাবে *সালাত* হচ্ছে অনুকূলতামূলক কর্মসূচী, কারো বা কোনো ব্যবস্থার অনুকূলে সাড়া দেয়ার ও কর্মকান্ড সম্পাদনের (রোল প্লে/ ভূমিকা পালন করার) প্রতীকী উপস্থাপন ধরনের কর্মসূচী এবং বাস্তবেও তার দাবি পূরণ করা। অন্য কথায়, আনুষ্ঠানিক *সালাত* হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি অনুকূলতামূলক প্রতীকী কর্মসূচী। এটি দুইভাবে হতে পারে (১) একাকী একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালনার রোল প্লে করা। (২) অনেকে একত্রে একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদেরকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালনার রোল প্লে করা।

সালাতের প্রকৃত স্বরূপ ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, *সালাত* প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, *সালাত* মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করে (২৯:৪৫)। আবার রসূলুল্লাহ শোয়ায়েবের *সালাত* প্রসঙ্গে জানানো তথ্য অনুসারে, তাঁর *সালাত* তাঁকে আদেশ দেয় আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব না করতে এবং স্বীয় সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা না করতে (১১:৮৭)। যারা *সালাতের* মধ্যে *খাশিয়ূন* (বিনীত) থাকে (২৩:২) এ হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে *সালাত* সম্পাদন করে না সেরূপ সালাতকারীদের সম্পর্কে ১০৭:৪-৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং

যারা সঠিকভাবে সালাত সম্পাদন করে তাদের সম্পর্কে ৭০:১৯-৩৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাতের প্রকারভেদ

সালাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সমন্বিত অধ্যয়ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *সালাত* তিন প্রকার। যথা:

১. দ্বীন সম্পর্কিত *বাস্তব* সালাত তথা বিশ্বপ্রভুর বিধানের নিবিড় অনুসরণ এবং তার সাথে স্বীয় ব্যক্তিত্বের সংযোগ সাধন বা অনুকূলতা বজায় রাখা।

২. দ্বীন সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক *সালাত* তথা বিশ্বপ্রভুর বিধানের নিবিড় অনুসরণমূলক আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী।

৩. কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* (আনুকূল্য, সহযোগিতা, অনুগ্রহ, আশীর্বাদ প্রার্থনা): যেসব আয়াতে *'আলা'* অব্যয় সহযোগে বা অনুরূপ অর্থগত অবস্থানে কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাতের* কথা এসেছে সেক্ষেত্রে *সালাত* হলো কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি অনুকূলতামূলক বা সংযোগমূলক বা যোগাযোগমূলক কর্মসূচী। এতে সহযোগিতা, অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতি *সালাত* করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্যাটার্নটি হলো: *সালাত + আলা* (একটি অব্যয়) + কোনো ব্যক্তিসত্তা। অর্থাৎ এতে কোনো না কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকে।

ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন-

৩.১ রসূলের প্রতি আল্লাহর ও ফেরেশতাদের *সালাত*। (৩৩:৫৬)

৩.২ রসূলের প্রতি মু'মিনদের *সালাত*। (৩৩:৫৬)

৩.৩ মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের *সালাত*। (২:১৫৭, ৩৩:৪৩)

৩.৪ মু'মিনদের প্রতি রসূলের *সালাত*। (৯:৯৯, ৯:১০৩)

৩.৫ মু'মিনদের প্রতি অন্য মু'মিনদের *সালাত* (মুনাফিকদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি *সালাতে* নিষেধাজ্ঞার পরোক্ষ শিক্ষা অনুসারে মু'মিনরা মু'মিনদের প্রতি *সালাত* করবে, এমনকি মৃত মু'মিনের প্রতিও)। (৯:৮৪)

সালাতের গুরুত্ব

আল কুরআন অনুসারে *সালাতের* গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে *সালাতের* গুরুত্বের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো:

১. *সালাত* সম্পাদনকারীরা জান্নাত লাভ করবে। (২৩:১-১১, ৭০:১৯-৩৫)

২. *সালাত* পরিত্যাগকারীরা জাহান্নামে যাবে। (৭৪:৩৮-৪৮, ১০৭:১-৭)

৩. *সালাত* ও *যাকাত* দ্বীন ইসলামের মৌলিক কর্মকাঠামো, যারা তা পরিপালন করবে তারাই পরস্পর দ্বীনী ভাই। (৯৮:৫, ৯:১১)

৪. আনুষ্ঠানিক *সালাত* সম্পাদন আল্লাহর আদেশ, যেজন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে এবং যার নির্দিষ্ট সময়সীমা ও প্রক্রিয়া রয়েছে। (৪:১০১-১০৩, ৫:৬, ৪:৪৩, ১৭:১১০, ১১:১১৪, ৬২:৯-১১)

৫. নিছক আনুষ্ঠানিক *সালাত* বা *সালাতের* আনুষ্ঠানিকতা কল্যাণ অর্জনে কোনো কাজে আসবে না। *সালাতের* প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং আনুষ্ঠানিক *সালাতের* শিক্ষানুসারে বাস্তব *সালাত* প্রতিষ্ঠাই পুণ্য কাজ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। (২:১৭৭, ১০৭:১-৭)

৬. যারা *সালাতকে* নষ্ট করেছে তথা আল্লাহ প্রদত্ত উদ্দেশ্য, শিক্ষা, প্রক্রিয়া ইত্যাদিকে প্রবৃত্তির অনুসরণে বিকৃত করেছে তারা কিতাবের নিকৃষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সাব্যস্ত। (৮:৩৫, ১৯:৫৯)

৭. *সালাতের* ক্ষেত্রে অলসতা করা মুনাফিকদের কাজ। (৪:১৪২, ৯:৫৪)। তাই মুনাফিকসুলভ জীবনধারা পরিহার করে নিজেকে মু'মিন হিসেবে আত্মগঠনের জন্য সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

৮. শয়তানের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে *যিকর* (আল্লাহর স্মরণ ও স্মরণিকা/কুরআন) থেকে এবং *সালাত* থেকে ফিরিয়ে রাখা। (৫:৯১)

৯. প্রকৃত মু'মিনদেরকে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য *সালাত* থেকে উদাসীন রাখতে পারে না। (২৪:৩৭)

১০. নিজে *সালাত* করার পাশাপাশি পরিবার-পরিজনকেও এ বিষয়ে আদেশ দিতে হবে। নবী ইবরাহীম তাঁর পরিবার পরিজনকে *'আল বাইতুল মুহাররাম'* তথা *কা'বার* কাছে আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন যেন তারা *সালাত* প্রতিষ্ঠা করে। (২০:১৩২, ১৪:৩৭)

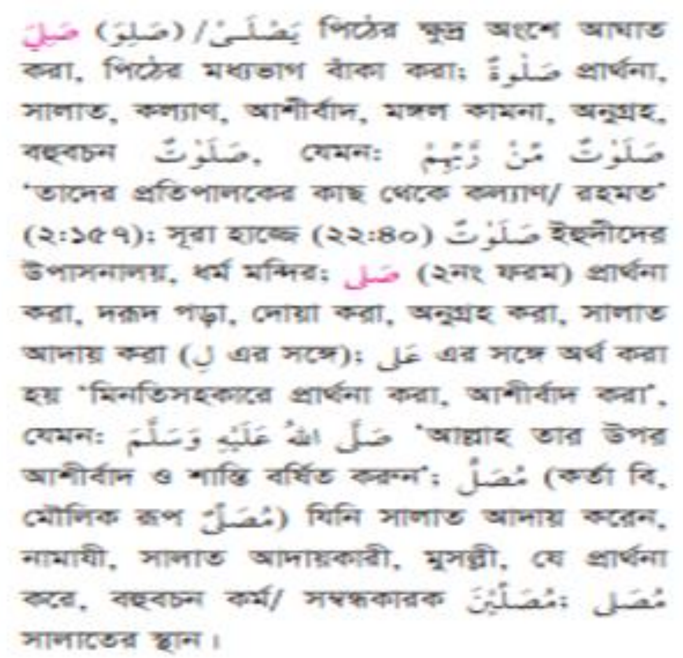
১১. *সালাত* নারী-পুরুষ সকলেই সম্পাদন করতে হবে। (৩৩:৩৩)

১২. নবী ঈসা বলেছেন যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন *সালাত* প্রতিষ্ঠা ও *যাকাত* প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। (১৯:৩১)

আল কুরআনের আলোকে সালাতের বিভিন্ন দিক

সালাত শব্দের অর্থ

সালাত শব্দটি একটি বহু অর্থবোধক শব্দ। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে 'কুরআনীয় অভিধান' গ্রন্থে *সালাত* শব্দের যেসব অর্থ দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো:



صَلِيَ (صَلِوَ)/ يَصْلَىٰ পিঠের ক্ষুদ্র অংশে আঘাত করা, পিঠের মধ্যভাগ বাঁকা করা: صَلٰوةٌ প্রার্থনা, সালাত, কল্যাণ, আশীর্বাদ, মঙ্গল কামনা, অনুগ্রহ, বহুবচন صَلَوٰتٌ, যেমন: صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ 'তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে কল্যাণ/ রহমত' (২:১৫৭): সূরা হাজ্জে (২২:৪০) صَلَوٰتٌ ইহুদীদের উপাসনালয়, ধর্ম মন্দির: صَلَّى (২নং ফরম) প্রার্থনা করা, দরূদ পড়া, দোয়া করা, অনুগ্রহ করা, সালাত আদায় করা (لِ এর সঙ্গে): عَلَى এর সঙ্গে অর্থ করা হয় 'মিনতিসহকারে প্রার্থনা করা, আশীর্বাদ করা', যেমন: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আল্লাহ তার উপর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত করুন': مُصَلٍّ (কর্তা বি, মৌলিক রূপ مُصَلِّيٌ) যিনি সালাত আদায় করেন, নামাযী, সালাত আদায়কারী, মুসল্লী, যে প্রার্থনা করে, বহুবচন কর্ম/ সম্বন্ধকারক مُصَلِّيْنَ: مُصَلًّى সালাতের স্থান।

সূত্র: মুহাম্মদ আবু হেনা, মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, কুরআ'নীয় অভিধান, একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ: মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২৬

কুরআনে সালাত শব্দটির প্রয়োগ এবং আরবি ভাষারীতি অনুসারে সালাত শব্দটির যেসব অর্থ পাওয়া যায় তার মোটামুটি একটি তালিকা হলো: (১) নিবিড় অনুসরণ (২) সংযোগ (৩) যোগাযোগ (৪) আনুকূল্য/ অনকূলতা (৫) সমর্থন, সহযোগিতা (৬) অনুগ্রহ (৭) দুআ বা আশীর্বাদ প্রার্থনা ইত্যাদি।

'সালাত' শব্দটি *'সল্লা'* ক্রিয়া (ক্রিয়ারূপ ২) এর *'মাসদার'* (ক্রিয়াবিশেষ্য) *'তাসলিয়া'* এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত।

'সল্লা' শব্দের অর্থ 'সে *তাসলিয়া / সালাত* করেছে'। অর্থাৎ *'তাসলিয়া'* শব্দের একটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে *'সালাত'*। এটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, ৯:১০৩ আয়াতে

বলা হয়েছে, *‘ওয়া সল্লি আলাইহিম, ইন্না সালাতাকা ছাকানুল্লাহুম’।* এখানে *‘সল্লি’* করার পর উহাকে *‘সালাতাকা’* শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৪:১০২ আয়াতেও *‘সালাত’* এবং *‘সল্লা’* শব্দের ব্যবহার থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, *‘সালাত’* হচ্ছে *‘সল্লা’* ক্রিয়া (ক্রিয়ারূপ ২) এর একটি *‘মাসদার’* (ক্রিয়াবিশেষ্য)। সুতরাং *‘সল্লা’* ক্রিয়ার দুটি মাসদার রয়েছে: *‘তাসলিয়া’* এবং *‘সালাত’*। *‘সালাত’* শব্দটি *‘ফায়ালাহ’* প্যাটার্নে গঠিত হয়েছে।

***‘সল্লা’* ও *‘আক্বামাস সালাত’* শব্দ দুটির পার্থক্য:**

‘সল্লা’ এর বিস্তৃত রূপ হচ্ছে *‘সল্লা সালাত’*।

‘*সল্লা*’ / ‘*সল্লা সালাত*’ = সে সালাত করলো।

‘আক্বামাস সালাত’ = সে সালাত প্রতিষ্ঠা করলো।

‘সল্লা’ / ‘সল্লা সালাত’ বাক্যে ‘সালাত’ শব্দটি হলো *‘মাসদার’* বা ক্রিয়া বিশেষ্য। কিন্তু *‘আক্বামাস সালাত’* বাক্যে *‘সালাত’* শব্দটি হলো *‘মাফঊল’* বা কর্মবিশেষ্য।

যখন কোনো *মাসদারকে মাফঊল* হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ *মাফঊলের* অর্থ হয় এমন কোনো সত্তা বা বিষয় যার মধ্যে ঐ ক্রিয়াবিশেষ্যে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

সালাত, রসূলের ব্যাপারে মু’মিনদের *সালাত,* মু’মিনদের ব্যাপারে রসূলের *সালাত,* মু’মিনের মৃত্যুর পর তার ব্যাপারে অন্য মু’মিনদের *সালাত* ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।

এর মধ্যে ৭৫:৩১-৩২ আয়াতে *সালাত* শব্দের কুরআনিক প্রায়োগিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যায়।

৭৫:২৯-৩২ :: এবং এক পায়ের গোছার সাথে আরেক পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। তোমার প্রভুর দিকেই সেদিন চালিয়ে নেয়া হবে। অথচ সে সত্যতা প্রতিপাদন করেনি এবং *সালাত* করেনি। কিন্তু সে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।

৭৫:৩১-৩২ আয়াতে *‘সদ্দাক্বা’* ও *‘সল্লা’* শব্দদ্বয়ের বিপরীত শব্দ হিসাবে যথাক্রমে *‘কাযযাবা’* ও *‘তাওয়াল্লা’* শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ *‘সদ্দাক্বা’* শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে *‘কাযযাবা’* এবং *‘সল্লা’* শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে *‘তাওয়াল্লা’*। *‘সদ্দাকা’* অর্থ ‘সত্যতা প্রতিপাদন করা’, *‘কাযযাবা’* অর্থ ‘মিথ্যা সাব্যস্ত করা’। *‘তাওয়াল্লা’* অর্থ ‘বিপরীতক্রমে বা বিমুখ হয়ে ফিরে যাওয়া’। সুতরাং *‘সল্লা’* হচ্ছে ‘অভিমুখী হয়ে এগিয়ে আসা’। অন্য কথায় বলা যায়, *‘তাওয়াল্লা’* হচ্ছে ‘প্রতিকূলতা’ এবং *‘সল্লা’* হচ্ছে ‘অনুকূলতা বা আনুকূল্য করা’। বিশেষ করে ৪:৮৮-৮৯ আয়াতের মধ্যকার ৪:৮৯ আয়াতে ব্যবহৃত *‘তাওয়াল্লাও’* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘জিঘাংসামূলক চরম প্রতিকূলে অবস্থান নেয়ার’ অর্থে। সুতরাং *‘সল্লা’* মানেও ‘ইতিবাচক কর্মসূচীসম্পন্ন অনুকূলতা’ হওয়াই স্বত:সিদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়। *‘তাওয়াল্লা’* অর্থ হলো: সঠিক জীবনব্যবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে প্রতিকূলতামূলক কর্মসূচীর সর্বাত্মক বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকা। এবং *‘সল্লা’* অর্থ হলো: সঠিক জীবনব্যবস্থার প্রতি অনুকূলতা বা ইতিবাচক সংযোগ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম করা।

প্রশ্ন হচ্ছে আয়াত দুটিতে *সদ্দাকা, কাযযাবা, সল্লা* ও *তাওয়াল্লা* বলতে কার বা কিসের প্রতি সত্যতা প্রতিপাদন করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আনুকূল্য করা বা প্রতিকূলে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে? বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট যে, এখানে গ্রহণীয় জীবনব্যবস্থার প্রতি সত্যতা প্রতিপাদন করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আনুকূল্য করা বা প্রতিকূলে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি সালাতের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিসত্তার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং তার আগে *‘আলা’* অব্যয়টি যুক্ত করা হয়।

সেই সাথে কুরআনে যেভাবে *সালাতের* শর্ত, সময়, পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ কথা স্পষ্ট যে, *সালাতের* একটি আনুষ্ঠানিক রূপও বিদ্যমান রয়েছে যা নিয়মিতভাবে দ্বীনের নিবিড় অনুসরণের প্রতীকী কর্মসূচীরূপে সম্পাদিতব্য। অর্থাৎ *সালাতের* দুটি ধরন রয়েছে, যথাঃ আনুষ্ঠানিক *সালাত* এবং বাস্তব *সালাত* তথা আনুষ্ঠানিক *সালাতের* শিক্ষা বাস্তবায়ন। সুতরাং *সালাতের* সংজ্ঞা হলো, গ্রহণীয় জীবনব্যবস্থার প্রতি আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব অনুকূলতামূলক কর্মসূচী সম্পাদন করা।

বস্তুত *‘সালাত’* হলো ‘কারো দিকে বা কোনো ব্যবস্থার দিকে ইতিবাচকভাবে অগ্রসর হওয়া’। এবং *‘তাওয়াল্লা’* হলো ‘কারো থেকে বা কোনো ব্যবস্থার থেকে নেতিবাচকভাবে মুখ ফিরানো বা মুখ ফিরিয়ে নেয়া’। যখন *‘আলা’* শব্দ যোগে সালাত করার কথা বলা

হয় তখন এর অর্থ হলো ‘কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা, কারো অনুকূলে অবস্থান নেয়া, কারো প্রতি সংযোগ রক্ষামূলক কর্ম সম্পাদন করা’।

২০:১৪ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর *যিকিরের* বা স্মরণের অনুশীলনের জন্য *সালাত* প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ৬২:১০ আয়াত অনুযায়ী সালাত *কাযা* বা যথানিয়মে সম্পাদনের পরে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে, আল্লাহর *ফযল* বা অনুগ্রহ তালাশ (তথা জীবিকা উপার্জন, শিক্ষাচর্চা ইত্যাদি) করতে হবে এবং তাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর *যিকির* বা স্মরণ করতে হবে।

সুতরাং একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি হিসাবে *সালাত* হচ্ছে অনুকূলতামূলক কর্মসূচী, কারো বা কোনো ব্যবস্থার অনুকূলে সাড়া দেয়ার ও কর্মকান্ড সম্পাদনের (রোল প্লে/ ভূমিকা পালন করার) প্রতীকী উপস্থাপন ধরনের কর্মসূচী এবং বাস্তবেও তার দাবি পূরণ করা। অন্য কথায়, আনুষ্ঠানিক *সালাত* হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি অনুকূলতামূলক প্রতীকী কর্মসূচী। এটি দুইভাবে হতে পারে (১) একাকী একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালনার রোল প্লে করা। (২) অনেকে একত্রে একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদেরকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালনার রোল প্লে করা।

সালাতের প্রকৃত স্বরূপ ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, *সালাত* প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, *সালাত* মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করে (২৯:৪৫)। আবার রসূলুল্লাহ শোয়ায়েবের *সালাত* প্রসঙ্গে জানানো তথ্য অনুসারে, তাঁর *সালাত* তাঁকে আদেশ দেয় আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব না করতে এবং স্বীয় সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা না করতে (১১:৮৭)। যারা *সালাতের* মধ্যে *খাশিয়ূন* (বিনীত) থাকে (২৩:২) এ হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে *সালাত* সম্পাদন করে না সেরূপ সালাতকারীদের সম্পর্কে ১০৭:৪-৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং যারা সঠিকভাবে সালাত সম্পাদন করে তাদের সম্পর্কে ৭০:১৯-৩৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সালাতের উদ্দেশ্য

সালাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সমন্বিত অধ্যয়ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *সালাত* তিন প্রকার। যথা:

১. দ্বীন সম্পর্কিত *বাস্তব* সালাত তথা বিশ্বপ্রভুর বিধানের নিবিড় অনুসরণ এবং তার সাথে স্বীয় ব্যক্তিত্বের সংযোগ সাধন বা অনুকূলতা বজায় রাখা।

২. দ্বীন সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক *সালাত* তথা বিশ্বপ্রভুর বিধানের নিবিড় অনুসরণমূলক আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী।

৩. কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* (আনুকূল্য, সহযোগিতা, অনুগ্রহ, আশীর্বাদ প্রার্থনা): যেসব আয়াতে *'আলা'* অব্যয় সহযোগে বা অনুরূপ অর্থগত অবস্থানে কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাতের* কথা এসেছে সেক্ষেত্রে *সালাত* হলো কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি অনুকূলতামূলক বা সংযোগমূলক বা যোগাযোগমূলক কর্মসূচী। এতে সহযোগিতা, অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতি *সালাত* করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্যাটার্নটি হলো: *সালাত* + *আলা* (একটি অব্যয়) + কোনো ব্যক্তিসত্তা। অর্থাৎ এতে কোনো না কোনো ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকে।

ব্যক্তিসত্তার প্রতি *সালাত* আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন-

৩.১ রসূলের প্রতি আল্লাহর ও ফেরেশতাদের *সালাত*। (৩৩:৫৬)

৩.২ রসূলের প্রতি মু'মিনদের *সালাত*। (৩৩:৫৬)

৩.৩ মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের *সালাত*। (২:১৫৭, ৩৩:৪৩)

৩.৪ মু'মিনদের প্রতি রসূলের *সালাত*। (৯:৯৯, ৯:১০৩)

৩.৫ মু'মিনদের প্রতি অন্য মু'মিনদের *সালাত* (মুনাফিকদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি *সালাতে* নিষেধাজ্ঞার পরোক্ষ শিক্ষা অনুসারে মু'মিনরা মু'মিনদের প্রতি *সালাত* করবে, এমনকি মৃত মু'মিনের প্রতিও)। (৯:৮৪)

পূর্ববর্তী নবীদের সালাত

সালাত যে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে বা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর সমকাল থেকে শুরু হয়েছে তা নয়। বরং কুরআন থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীদের সময়ও *সালাতের* নির্দেশ ও অনুশীলন ছিল। নিম্নে বিভিন্ন নবীর *সালাতের* প্রসঙ্গ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের নাম্বার উল্লেখ করা হলো:

১. নবী ইবরাহীমের *সালাত* ১৪:৩৭, ১৪:৪০

২. নবী ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রমুখের *সালাত* ২১:৭৩

৩. নবী ইসমাইলের *সালাত* ১৯:৫৫

৪. নবী মূসার *সালাত* ২০:১৪

৫. নবী যাকারিয়ার *সালাত* ৩:৩৯

৬. নবী ঈসার *সালাত* ১৯:৩১

এছাড়াও ২:৮৩ আয়াতে বনী ইসরাইলের *সালাত* এবং ৩১:১৭ আয়াতে লুকমান এর *সালাত* প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ৯৮:৫ আয়াত অনুযায়ী, অতীতে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সবাইকে *সালাতের* জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রার্থনা ও সালাত

আমরা কুরআনের মাধ্যমে জানতে পারি যে, রসূলুল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছেন,

"এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে *সালাত* ও *যাকাত* আদায় করতে আদেশ করেছেন'। *১৯:৩১*

বাইবেল ও ইতিহাসসূত্রে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ ঈসা (সালামুন আলাইহি) রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের (সালামুন আলাইহি) কাছে কুরআন নাযিলের প্রায় ৬০০ বছর আগে তাঁর নবুয়াত পূর্ণ করেন। বাইবেলের বিবরণে আমরা দেখি যে, রসূলুল্লাহ ঈসা নিয়মিত *সালাত* / প্রার্থনা করতেন।

ঈসা নবীর জন্ম হয়েছিলো বনী ইসরাইল গোত্রে এবং তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বনী ইসরাইল জাতির কাছে (সুরা আস-সফ, ৬১:৬) আল্লাহর দ্বীন প্রচারে। আল্লাহ তাঁকে *কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল* শিক্ষা দিয়েছেন।

স্রষ্টায় আত্মসমর্পনকারী মুসলিম হিসেবে আমরা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে আল্লাহর তরফ থেকে বলে মানি এবং রাসুলদের মধ্যে কাউকে বাদ দেই না বা তাদের মধ্যে তারতম্য করি না। এ কারণেই, মূল তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কিছু অংশ বিকৃত হোক বা না হোক, আমরা ঈসার সালাত / প্রার্থনা / স্রষ্টার সাথে সংযোগের বিবরণগুলো পাঠ করে তার সালাত সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রশস্ত করতে পারি।

কিভাবে তারা *সালাত* করবে, এই প্রশ্নের উত্তরে নবী ঈসা আ. যেভাবে *সালাত* করার নির্দেশনা দেন যা বাইবেলে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যেটিকে এখন অব্দি ঈসার মিল্লাতের অনুসারীরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা হিসেবে সংরক্ষণ করে আসছে। ঈসার মাতৃভাষা ছিলো আরামাঈক ভাষা যা হিব্রু ভাষা থেকেও প্রাচীন। এই *সালাতের* আয়াতগুলো ঈসায়ী পরিভাষায় 'লর্ডস প্রেয়ার' নামে পরিচিত [(৪)] ।

(৪) লর্ডস প্রেয়ার, উইকিপিডিয়া https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer

আমরা এই প্রার্থনার প্রতিটি আয়াত মূল আরামাঈক ভাষার উল্লেখপূর্বক এখানে পর্যালোচনা করছি:

১.আবুন দ'বিস সামাই, নেতকাদাস ইসমাখ

"আমাদের আসমানি প্রতিপালক পিতা, পবিত্র তোমার নাম"

২.তেতে মালাকুতাখ

"তোমারই সার্বভৌমত্ব"

৩. নেহওয়ে যেওয়ানাখ আয়কান্না দ'বিওয়াহমায়া আফ বা'আরহা

"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক যেরূপ স্বর্গে, সেরূপ মর্ত্যে"

৪. হাবলান লাখমা দ'সুনকানান ইয়ামানা

"আমাদের প্রয়োজনের লোকমা দান করো এই দিনে"

৫. ওয়াহ বুকলান খাওআন আয়কান্না দাফ খনান শবোকান ইখায়য়াবান

"আমাদের জুলুমকে/ অন্যায়কে ক্ষমা করো, যেরূপ আমরা ক্ষমা করি আমাদের উপরে জুলুককারীদের / অন্যায়কারীদের"

৬. ওয়া লা তাহলানাল নিসুনা ইল্লা পাসসান মিন বিশা

"আমাদের পরীক্ষায় ফেলো না বরং শয়তানের চক্রান্ত থেকে মুক্তি দাও"

৭. মেতোল দিলাখি মালকুথা ওয়া হায়লা ওয়াতিসবুখতাল আহলাম আলমিন

"কেননা তোমারই সার্বভৌমত্ব এবং ক্ষমতা এবং মহিমা। যুগে যুগে এবং চিরদিন"।

উপরের আয়াতগুলো যদি আমরা ফাতিহার সাথে তুলনা করি তাহলে ভাবগত অনেক সাদৃশ্য আমাদের কাছে উজ্জ্বল হবে।

ঈসা স্রষ্টাকে *'আবুন'* বা 'আমাদের পিতা' নামে সম্বোধন করতেন এবং এই সম্বোধন ছিলো প্রতিপালন করার অর্থে।

ফাতিহায় আমরা *'রাব্বিল আলামীন'* সম্বোধন করে সেই প্রতিপালন অর্থেই *রব্ব* তথা জগতের প্রতিপালককে স্মরণ করি।

'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার মহিমান্বিত নামকে স্বরণ করি। একইভাবে ঈসায়ী সালাতে আমরা দেখি তিনি *'নেতকাদাস ইসমাখ'* - প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন শুরুতেই।

আরামাঈকে *'ইসমাখ'*, আরবীর *'ইসম'* এর খুব কাছাকাছি। আরামাঈক, হিব্রু এবং আরবী - সবগুলোই সেমিটিক ভাষা যাদের উৎস খুব কাছাকাছি।

সুরা ফাতিহায় আমরা স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে ক্বিয়ামাত দিবসকে স্বরণ করি। ঈসায়ী সালাতেও আমরা বারবার স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকটি পাই।

ফাতিহায় যেমন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে স্রষ্টার দেখানো পথে চলার শক্তি চাওয়া হয়, যারা নিয়ামত প্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের মধ্যে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত দিয়ে নিয়ামতের পথে চালিত হওয়ার শক্তির আকাঙ্ক্ষা করা হয়, ঠিক তেমনি ঈসায়ী সালাতের শেষভাগটায় আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জীবন চলার ক্ষেত্রে পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি পাই।

লক্ষণীয় যে সূরা ফাতিহা যেমন ৭টি আয়াত, তেমনি ঈসায়ী সালাতের মূলভাব ৭টি আয়াতে বিভক্ত।

এই আয়াতগুলো থেকে সম্ভবত আমরা এই উপসংহারে পৌছাতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে যুগে রাসুলরা যে সালাত করেছেন সেগুলোর ভাষা এক না হলেও (ভাষা এক হওয়া সম্ভব নয়, কেননা স্বজাতির ভাষাতেই তাদেরকে পাঠানো হতো), সেগুলোতে স্রষ্টার প্রতি সমর্পণ, স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা এবং ব্যক্তিগতভাবে জীবনযাপনে স্রষ্টার নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাব্য অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া - এই বিষয়গুলোই মূল ছিলো।

ঈসা ইবনে মারইয়াম কখন কখন সালাত করতেন এর উত্তরে আমরা ইঞ্জিলে কিছু হিন্টস পাই যেমন:

খুব ভোরে সালাত করতেন (মার্ক ১:৩৫), তার শিষ্যরা দুপুরে এবং অপরাহ্নে সালাত করতেন (এক্টস ১০:৯, ৩:১), ঈসা সন্ধ্যায় সালাত করতেন (১৪:২৩) এবং রাতেও সালাত করেছেন (১৪:৩৩-৩৯)। উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাইল তাওরাত অনুসারে তিনবার সালাত করে, সকাল, দুপুরের পর এবং সন্ধ্যায়। সুতরাং বনী ইসরাইলের মিল্লাতে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঈসাও যে একই সময়গুলোতে সালাত করবেন সেটিই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া যায় এবং পূর্ববর্তী কিতাব থেকেও এটির সমর্থন পাওয়া যায়।

সালাত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক না হওয়ার প্রমাণ

সাধারণত অনুবাদে *সালাত* শব্দটির শব্দার্থ হিসেবে ‘নামাজ’ শব্দটি লেখা হয় এবং ‘নামাজ’ বলতে একটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসম্পন্ন কর্মসূচীকে বুঝানো হয়।

কুরআনের কিছু আয়াতে এরূপ আনুষ্ঠানিক সালাতের নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনের অনেক আয়াতে *সালাত* শব্দটি আনুষ্ঠানিক *সালাতের* অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যাপক অর্থে বা বাস্তব *সালাতের* অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, *সালাত* শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়। অন্য কথায়, কুরআনের প্রেক্ষিতে *সালাতের* ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং নির্দিষ্ট ও সীমিত দুই ধরনের অর্থই বুঝা যায়। সামগ্রিক ও ব্যাপক অর্থে *সালাত* প্রতিষ্ঠা করা অর্থ স্রষ্টার বিধান, স্রষ্টার নির্দেশনা, স্রষ্টার যে প্রদর্শিত ও নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা সেটিকে জীবনে প্রয়োগ করা; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত - উভয় ক্ষেত্রেই। এবং নির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থে *সালাত* একটি বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি যেখানে স্রষ্টার বিধান ও নির্দেশনাবলী পাঠের মাধ্যমে স্রষ্টার স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শব্দের অর্থের ব্যাপকতার মাত্রা

আল কুরআনে *সালাত* শব্দটি আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব *সালাত* উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিষয়টি অনুধাবনের সুবিধার জন্য প্রথমে শব্দের অর্থের ব্যাপকতার মাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। কোনো শব্দ দ্বারা যদি কোনো স্থানে ব্যাপক বিষয়কে বুঝানো হয় এবং কোনো স্থানে তার মধ্যকার কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তা সীমিত হওয়ার মতো নিয়ামক প্রসঙ্গ থাকে, তাহলে ঐ নিয়ামক প্রসঙ্গসম্পন্ন স্থানে ছাড়া অন্য স্থানে তা ব্যাপক ও বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সাব্যস্ত হয়।

সালাত শব্দ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সমন্বিত অধ্যয়নের মাধ্যমে নির্ণিত সূত্র

যে ক্রিয়াবিশেষ্য দ্বারা এমন কোনো কাজকে বুঝায় যা সম্পাদনের জন্য কোনো পূর্বশর্ত রয়েছে বা যার কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো (শুরু-শেষ ও প্রক্রিয়া) রয়েছে, সেটি দ্বারা একটি আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, যে আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্রিয়াবিশেষ্যের অর্থের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা বিদ্যমান থাকে। এবং কাজটি যদি কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণমূলক হয় তবে ঐ আনুষ্ঠানিক কাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নমূলক কাজসমূহও ঐ ক্রিয়াবিশেষ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নমূলক কাজসমূহ ছাড়া নিছক আনুষ্ঠানিক কাজটির সম্পাদনকারী ব্যক্তি কাজটি সঠিকভাবে

সম্পন্ন করেনি এবং আনুষ্ঠানিক কাজটির দ্বারা কোনো সুফল পাবে না বলে সাব্যস্ত হবে। তারাই কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করেছে বলে সাব্যস্ত হবে যারা আনুষ্ঠানিক কাজটি করবে এবং সেই সাথে ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মকাণ্ডেও ঐ ক্রিয়াবিশেষ্যের অর্থের ব্যাপকতার সাথে সম্পর্কিত কাজসমূহ (বা আনুষ্ঠানিক কাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নমূলক কাজসমূহ) সম্পাদন করবে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন ও বস্তুনিষ্ঠ থাকতে হবে।

সালাত কোন স্থানে ব্যাপক অর্থে এবং কোন স্থানে আনুষ্ঠানিক সালাত অর্থে

'সল্লা' বা *'আক্বামাস সালাত'* বলতে কোথায় 'আনুষ্ঠানিক *সালাত*' এবং কোথায় 'ব্যাপক বা বাস্তব *সালাত*' বুঝানো হয়েছে তা চিহ্নিত করার উপায় হচ্ছে যেখানে *সালাতের* জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আহবান করা বা তা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় সম্পন্ন করা বা সেজন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আসার বিষয় উল্লেখ থাকে; *সালাতের* জন্য কোনো পূর্বশর্ত পালন করা, *সালাতের* পরে অন্য কাজের অবকাশ বা আদেশ এবং কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা প্রক্রিয়ায় তা সম্পাদন করার উল্লেখ থাকে, তখন তা দ্বারা আনুষ্ঠানিক সালাত বুঝানো হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়। অন্যদিকে যখন এসব বিষয় ছাড়া *সালাত* করার বা *সালাত* প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয় তখন *সালাত* শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। এই ব্যাপক অর্থের মধ্যেও অনুরূপ কিছু প্রায়োগিক দিক রয়েছে যা হলো: কুরআনের মধ্যে স্রষ্টার যে বিধান রয়েছে সেই বিধানের শিক্ষাচর্চার আয়োজন, বৈঠক, ধর্ম অধিবেশন। *সালাতের* আনুষ্ঠানিক উপাসনা পদ্ধতির বাধ্যতামূলক পর্যায়ের কাঠামো নির্ধারিত হবে সম্পর্কিত সকল আয়াত থেকে যতটুকু কাঠামো পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে। এবং প্রচলিত কাঠামোতে অতিরিক্ত কিছু থাকলে এবং তা আয়াতসমূহে বর্ণিত নির্দেশনার সম্পূরক হলে তা আপত্তিকর নয়, তবে সেটিকে বাধ্যতামূলক বা বিধান মনে করা যাবে না। আনুষ্ঠানিক *সালাতের* ক্ষেত্রেও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করাই হলো *সালাত* প্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ রূপ। এবং বাস্তব *সালাতের* ক্ষেত্রে বাস্তবে আল্লাহর বিধানের নিবিড় অনুসরণই *সালাত* প্রতিষ্ঠা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রে সমগ্র জীবনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নের উদ্যোগই *সালাত*, তবে প্রথম অবস্থায় আনুষ্ঠানিক বিষয়টি প্রাথমিক গুরুত্ব পায় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুষ্ঠানিক বিষয়টি গৌন গুরুত্ব পায়।

যে সকল আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে আনুষ্ঠানিক *সালাতকে* বুঝানো হয়েছে তা ছাড়া বাকি আয়াতগুলোতে *সালাত* শব্দটি আনুষ্ঠানিক *সালাত* এবং বাস্তব *সালাত* উভয় প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। বিশেষ করে যে আয়াতগুলোতে *সালাত* শব্দটি দ্বারা বাস্তব *সালাতকে* বুঝানো হয়েছে তা হলো ৭০:২২-৩৪ এবং ১০৭:৪-৭। ৭০:২২-৩৪ আয়াতে মুসল্লীনের তথা সালাতকারীদের যে পরিচয় (সংজ্ঞা) উল্লেখ করা হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতসমূহে *সালাত* দ্বারা বাস্তব *সালাতকে* বুঝানো হয়েছে, আনুষ্ঠানিক *সালাতকে* নয়। অনুরূপভাবে ১০৭:৪-৭ আয়াতে যে ধরনের মুসল্লীনের জন্য দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে তাও বাস্তব *সালাতকে* নষ্ট করার (নষ্ট *সালাত* সম্পাদন করার) কারণে।

সুতরাং আল কুরআনে আনুষ্ঠানিক সালাতকেও সালাত বলা হয়েছে এবং বাস্তব সালাতকেও সালাত বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে সালাত বলতে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সালাতকে বুঝায় না।

সালাতের মূল অর্থ এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সম্পর্ক বিষয়ক উদাহরণ

একটি উদাহরণের মাধ্যমে *সালাতের* মূল অর্থ এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন ট্রাফিক পুলিশকে দায়িত্ব দেয়া হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য এবং বলা হলো এজন্য সে ‘লাল, সবুজ ও কমলা আলোর সংকেত’ ব্যবহার করতে হবে। এখন যদি সে আলোর সংকেত ব্যবহার ছাড়া ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করে তাহলে সে পরিপূর্ণ নির্দেশনা পালন করা হলো না। আবার যদি সে শুধু আলোর ব্যবহার করে কিন্তু ট্রাফিক কন্ট্রোলের মূল কাজটি না করে তাহলে তার আলোর ব্যবহার সঠিক উদ্দেশ্য পরিপূরণে ব্যর্থ হতে পারে।

অনুরূপভাবে *‘সালাত’* অর্থ হচ্ছে ‘আল্লাহর বিধানের নিবিড় অনুসরণ, সংযোগ, অনুকূলতা’। এজন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যেন এই মূল কাজটি করার জন্য মনোদৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজেকে সময়ে সময়ে রিচার্জ করে নেয়া হয়। এখন কেউ যদি এ আনুষ্ঠানিক কাজটিকেই একমাত্র সালাত বলে মনে করে সে আলোকসজ্জাকেই ট্রাফিক কন্ট্রোল হিসেবে যথেষ্ট মনে করলো।

এবং কেউ যদি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটি ছাড়াই আল্লাহর বিধানের নিবিড় অনুসরণের অনুশীলন করতে সচেষ্ট হয়, সেও একদিকে পরিপূর্ণ নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় না, অন্যদিকে মানবীয় দুর্বলতা হেতু নিবিড় অনুসরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হবে না এবং আলোর ব্যবহার যে ট্রাফিক কন্ট্রোলের প্রাথমিক রূপ তা অস্বীকার করা হয়।

এ উদাহরণে আলোর ব্যবহার হচ্ছে আনুষ্ঠানিক *সালাতের* প্রতীক, মূল ট্রাফিক কন্ট্রোল হলো ব্যাপক অর্থে *সালাতের* প্রতীক।

আনুষ্ঠানিক *সালাতের* আনুষ্ঠানিক বা কাঠামোগত দিক উপলব্ধির জন্য আরেকটি উদাহরণ হলো 'সেনাবাহিনীর প্যারেড'। যখন কেউ সাধারণভাবে দাঁড়ায় বা হাঁটে সেটাকে প্যারেড বলা হয় না এবং এর পূর্বশর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট পোশাক পরারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্যারেডে উপস্থিত হওয়ার আগে নির্দিষ্ট পোশাক পরে আসার শর্ত থাকে। এবং প্যারেডে একটা শৃঙ্খলার সাথে দাঁড়াতে হয় এবং পদচারণার ক্ষেত্রে 'লেফট-রাইট' একটা ছন্দ বজায় রাখতে হয়। যে কোনো সময়ের দাঁড়ানোকে প্যারেডে দাঁড়ানো বলে না, শুধু যখন কেউ প্যারেড করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় সেটাকে প্যারেডে দাঁড়ানো বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যখন আনুষ্ঠানিক *সালাতের* উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো হয় তখন সেটাকে বলা হয় '*সালাতে* দাঁড়ানো' এবং '*সালাতে* দাঁড়ানোর পূর্বশর্ত' হিসেবে *ওজু-গোসল-তায়াম্মুম* বা শরীর-পোশাক ও *সালাতের* স্থানের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার শর্ত রয়েছে। প্যারেড যেমন একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রতীকী শৃঙ্খলা, আনুষ্ঠানিক *সালাতও* তেমনি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রতীকী শৃঙ্খলা। কেউ যদি প্যারেডের শৃঙ্খলা রক্ষা করে কিন্তু বাস্তব রণাঙ্গনে কমান্ড ফলো না করে তার প্যারেড যেমন মূল্যহীন, তেমনি যে আনুষ্ঠানিক *সালাত* করে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্বর্গীয় বিধান অনুসরণ করে না তার আনুষ্ঠানিক *সালাত* মূল্যহীন।

আনুষ্ঠানিক বিষয়ের গুরুত্ব, নিছক আনুষ্ঠানিকতার মূল্যহীনতা এবং আনুষ্ঠানিক কাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ

মানুষের জীবনে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে। আনুষ্ঠানিক বিষয় শৃংখলা, প্রশিক্ষণ, কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে সম্পূরক মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য উপযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু নিছক আনুষ্ঠানিকতা একটি মূল্যহীন বিষয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক বিষয় যদি অনুষ্ঠানসর্বস্বতা হয়ে পড়ে তবে তার কোনো গুরুত্ব নেই। এবং আনুষ্ঠানিক কাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ কোনো আনুষ্ঠানিক কাজ যথাযথভাবে করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা। আনুষ্ঠানিক সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থও অনুরূপ। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক *সালাত* যথাযথভাবে সম্পাদন করে *সালাতের* শিক্ষা অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ অব্যাহত রেখে তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করলেই *সালাত* প্রতিষ্ঠা করা হয়। *সালাতের* অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পূর্ণরূপে *সালাত* প্রতিষ্ঠা করা যায় না, আবার *সালাতের* অনুষ্ঠান করলে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পালনের অনুশীলন না করলে সে মুসল্লিদের (সালাতকারীদের) জন্য দুর্ভোগ (সূরা মাউন)।

সালাতের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর পর্যালোচনা

আনুষ্ঠানিক সালাতের বাহ্যিক বাধ্যতামূলক কাঠামো হচ্ছে *‘ক্বিয়াম,* (কুরআন থেকে বা কুরআন বাস্তবায়নের জন্য) কথা বলা (*ক্বওল*) ও *সাজদাহ*’। (৪:৪৩, ৪:১০২)

‘ক্বিয়াম’ শব্দের মূল অর্থ ‘দাঁড়ানো’। এর ইতিবাচক ভাবার্থ হলো উদ্যোগী হওয়া এবং নেতিবাচক ভাবার্থ হচ্ছে থমকে যাওয়া।

অনুরূপভাবে *‘সাজদাহ’* শব্দের মূল অর্থ হলো ‘কারো প্রতি ভক্তির অভিব্যক্তি, যে ভক্তির স্বরূপ যে সত্তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হবে তার সাথে ভক্তের সম্পর্কের ধরনের উপর নির্ভর করে’। *সাজদাহর* ভাবার্থ হচ্ছে ‘মনোভাবগত ও আচরণগতভাবে প্রণত হওয়া বা থাকা এবং ভক্তি প্রদর্শন বা নির্দেশ পরিপালনে নতশির হয়ে থাকা’।

বিচ্ছিন্নভাবে ‘ক্বিয়াম’, ‘কথা বলা (ক্বওল)’ ও ‘সাজদাহ’ করলে তা সালাত নয় এবং সেজন্য *ওজু* (*গোসল*) বা *তায়াম্মুম* করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন তা আনুষ্ঠানিক সালাত হিসেবে একক কাঠামোবদ্ধভাবে করা হয় তখন সেজন্য *ওজু* (*গোসল*) বা *তায়াম্মুম* করার শর্ত রয়েছে। (৫:৬, ৪:৪৩)

ক্বিয়াম-সাজদাহর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সালাত হওয়া এবং সালাত না হওয়া এই দুই অবস্থার পার্থক্য অনুধাবন করা যেতে পারে প্যারেড থেকে। সাধারণভাবে দাঁড়ানো বা হাঁটা প্যারেড নয়, কিন্তু যখন প্যারেড হিসেবে সুসংবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ও মার্চ করা হয় তখন তা প্যারেড নামে সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে যখন আনুষ্ঠানিক সালাত হিসেবে *ক্বিয়াম-সাজদাহ* করা হয় তখন তা আনুষ্ঠানিক সালাত নামে সাব্যস্ত হয় এবং তার পূর্বে ওজু করতে হয়।

সালাত কী ও কেন?- প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক সালাতের তাৎপর্য

সালাত কী ও কী নয় তা নিয়ে এখনো ব্যাপক বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। এর অন্যতম একটি দিক হলো- আনুষ্ঠানিক সালাত আছে নাকি নেই?
আমরা যদি সালাতের মৌলিক অর্থ থেকে দেখা শুরু করি, তাহলে এ আরবি শব্দটিকে 'সংযোগ ও যোগাযোগ' অর্থে পাওয়া যায়।
এ সংযোগ বিশ্বাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বাসীরা যদি স্রষ্টার সাথে তাঁর বিধান অনুশীলনের মাধ্যমে সংযোগ বা যোগাযোগ রক্ষা না করে তাহলে তারা তার স্মরণ করতে পারবে না এবং তাঁর বিধান পালন থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে।
স্রষ্টার বিধান মেনে চলার জন্য প্রয়োজন তাঁর বিধান জানা ও মানার প্রক্রিয়ায় নিজেকে সংযুক্ত রাখা। এই সংযুক্তিই সালাত।
স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের সংযুক্তি হিসেবে মানুষকে তিনটি প্রধান কর্মসূচী পালন করতে হয়। (১) স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়ে দাঁড়ানো তথা উদ্যোগী হওয়া, (২) স্রষ্টার বিধানের সীমারেখায় ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য যথা প্রার্থনা, অঙ্গীকার ও অন্যকে উদ্বুদ্ধকরণমূলক কথা, (৩) স্রষ্টার প্রতি সম্মান রেখে ও নিরহংকারের সাথে যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁর বিধানকে মেনে নেয়ার অভিব্যক্তি।
এ তিনটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নাম হলো : (ক) ক্বিয়াম, (খ) ক্বওল এবং (গ) সাজদাহ।

এ ক্বিয়াম, ক্বওল ও সাজদাহর যোগফলই সালাত।
যখন এই সংযুক্তিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয় তা হলো আনুষ্ঠানিক সালাত, যার উদ্দেশ্য হলো সেই সংযুক্তিকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীকী স্ব-প্রশিক্ষণ।
ক্বিয়াম, ক্বওল ও সাজদাহ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় তখন তা শব্দগুলোর ভাবার্থের চেয়েও প্রাথমিক স্বরূপকে বেশি ধারণ করে।
ক্বিয়াম অর্থ দাঁড়ানো। আমরা কাউকে দেখে যখন বলি সে দাঁড়িয়ে আছে এটাই দাঁড়ানোর অবস্থা।
ক্বওল অর্থ বক্তব্য প্রকাশ করা। আমরা যখন কারো সম্পর্কে বলি যে, সে কিছু বলছে, সেটাই কথা বলার অবস্থা।
সাজদাহ অর্থ মাথাবনত করে সম্মান জানানো। আমরা কারো যে কাজটি দেখে বলি সে সাজদাহ করছে সেটাই সাজদাহ করার অবস্থা।
আনুষ্ঠানিক সালাত করার পর যখন তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা হয় সেটাই সালাত কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা।
কুরআনে নিছক আনুষ্ঠানিক সালাতের মূল্য নেই, তবে সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য এই আনুষ্ঠানিক রূপকে উদ্দেশ্যনিষ্ঠ থেকে সম্পাদন করার নির্দেশনা রয়েছে।

কুরআনে নামাযের গুরুত্ব : কিছু দিক কিছু কথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

আমরা যদি এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে

বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

নামাযের আদেশ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ
اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ

عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِیَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।-সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।-সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

أُتْلُ مَآ أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।-সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।-সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ১১০, সূরা আনআম ৭২, সূরা নূর ৫৬, সূরা রূম ৩১, সূরা মুজাদালা ১৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ স¤প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম

যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیۡۤ اَنَا رَبُّکَ فَاخۡلَعۡ نَعۡلَیۡکَ ۚ اِنَّکَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًی وَاَنَا اخۡتَرۡتُکَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি

ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।-সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির[১] এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির...।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।-সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।-সূরা মায়েদা (৫) : ১২

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়িনা ৫

নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।-সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল।

গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।- সূরা নামল (২৭) : ১-৩

এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।-সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।-সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)।

এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-

জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ
يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى
وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ .

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।-সূরা মাআরিজ (৭০) : ২৩-৩৫

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।[২]

মজার ব্যাপার এই যে, সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

ফলে প্রত্যেক মুসলমান এক আল্লাহ, পরকালীন পরিণতি, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও নবী-রাসুলের প্রতি অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে। তাদের সবাই একই নিয়মে আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার জামাতে অংশগ্রহণ করে, অসহায়, ঋণগ্রস্ত ও পথিকের জন্য জাকাতের অর্থ ব্যয় করে, এক মাস আল্লাহর জন্য রোজা রাখে, জীবনে অন্তত একবার হজব্রত পালন করে। তারা এসব ইবাদত পালন করে একই নিয়মে, একই সময়ে, একই রকম পোশাক পরিধান করে (ইহরাম উদ্দেশ্য), তাদের মুখে থাকে একই ধ্বনি হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত।

এরই ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করে, তারা সবাই আদি পিতা আদম (আ.)-এর সন্তান এবং পরস্পরের ভাই। তাই তারা তাদের ভাইকে ভালোবাসে। কেননা হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না

সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' -সহিহ বোখারি : ১৩

ঈমানের দাবি এই ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা মুসলমানকে অগ্রাধিকার দিতে শেখায়। ফলে মুমিন অন্য মুমিনের প্রতি হয় বিনম্র। তারা পরস্পরের ওপর অহংকার করে না। কেননা তা গুরুতর অপরাধ। মুমিন পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করে না। কেননা তা অন্তরের পাপ এবং আল্লাহ হিংসুকের নিন্দা করেছেন। একইভাবে তারা কোনো মুমিনকে উপহাস করে না, তার প্রতি দোষারোপ করে না এবং মন্দ নামে ডাকে না।

এমনকি মুমিন পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করে, বিরূপ ধারণা পোষণ করে না, কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করে না। কেননা আল্লাহতায়ালার নির্দেশ হলো, 'হে মুমিনরা, তোমরা বেশির ভাগ অনুমান থেকে দূরে থাকো। কেননা অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা পরস্পরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। আর পরস্পরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তাকে ঘৃণ্যই মনে করো।' -সুরা হুজরাত : ১২

যখন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ এমন, তখন তাদের মধ্যে বিবাদ-সংঘাত কিভাবে হতে পারে। এই শিক্ষা, মূল্যবোধ ও শিষ্টাচার মুসলিমকে সব সময় অন্য মুসলিম থেকে সংযত করে!

ধর্মীয় গুরুত্ব

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম । সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে । এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে । ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয় । মানুষকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত করে তোলে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উওকারী । সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন, "যে ব্যাক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নুর হবে ।" (তাবারানি)

একদা হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথিদের লক্ষ্য করে বলেন- 'যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং কোনো লোক দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' সাহাবিগণ উত্তরে

বললেন, 'না' হে আল্লাহর রাসুল! তখন মহানবি (স.) আরও বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক তেমনি তার (সালাত আদায়কারীর) গুনাহসমুহ দূর করে দেয় । মহানবি (স.) আরও বলেছেন, "সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য ।" (তিরমিযি)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, "জামাআতের সালাত আদায় করলে একাকী আদায় করার চাইতে সাতাশ গুন বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় ।" (বুখারি ও মুসলিম)

> *আর আল্লাহ তায়ালাও সালাতকে জামাআতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন । আল্লাহ বলেন,*
>
> وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين

অর্থঃ "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর ।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

সামাজিক গুরুত্ব

প্রবিত্র কুরআনের বহুস্থানে বহু সম্মিতিলভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় । একে-অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারে । সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে । এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয় । এমনকি নামাযের সারিতে দারাতে গিয়ে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না । ফলে সালাত আদায়কারীর মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয় । সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পারস্পারিক সকল মতপার্থক্য ভুলে একসাথে কাজ করার শিক্ষা পায় ।

সালাত আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয় । নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্ভুদ্ধ করে । আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত সালাত আদায় করব । জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

- 0 

সময়মতো নামাজ পড়ার গুরুত্ব

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি নামাজ। প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন নর-নারীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ে এই নামাজগুলো আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্যপালনীয় কাজ। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ‘নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনের অবশ্যকর্তব্য।’ (সুরা নিসা: ১০৩)

যথাসময়ে ফরজ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম, ‘আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি?’ তিনি

বললেন, 'যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' তিনি আমাকে এ কথাগুলো বললেন। যদি আমি আরও প্রশ্ন করতাম তা হলে তিনি আরও অতিরিক্ত বিষয়ে বলতেন। (বুখারি)

বিভিন্ন ব্যস্ততার অজুহাতে অনেকে নামাজ সময়মতো আদায় করেন না কিংবা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'দুর্ভোগ সেই নামাজিদের জন্য, যারা নামাজ সম্পর্কে উদাসীন।' (সুরা মাউন: ৪-৫)

ফরজ নামাজ ত্যাগ করার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, তারা থাকবে জান্নাতে। তারা জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, 'কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে গেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবীদের খাওয়াতাম না। আর অহেতুক আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম।' (সুরা মুদ্দাসসির: ৪০-৪৬)

নামাজে সাহাবাদের মনোযোগ :

নামাজ পড়া মানে মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করা। দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়ে থাকে! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে কেমন হওয়া চাই আমাদের অবস্থা! অবশ্যই ভয়-ভীতি ও মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!' (বুখারি : ৪১৩)। সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে নামাজ আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায় শিখেছিলেন। ঘরে, বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন।

হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। একবার নামাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রা.) একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব

ভালো লাগল। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর আবার নামাজের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এ সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!

হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২১৪)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছেÑ হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোনো সঙ্গীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হব না। তখন সে নবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী (সা.) এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে মশগুল

হয়ে পড়েন। এমন সময় ওই লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখে চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তিনি রুকু সিজদা করে (যথারীতি নামাজ শেষ করে) সঙ্গীকে জাগালেন।

মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাজে) এমন একটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' (আবু দাউদ : ১৯৮)

সাহাবায়ে কেরামের নামাজের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের নামাজ ছিল সত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের নামাজও যেন হয় এমন খুশু-খুজুর অনুভূতিতে পূর্ণ। যারা এমন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন 'সফলকাম ওইসব মুমিন, যারা তাদের নামাজে খুশুখুজু (পূর্ণ মনোযোগ) অবলম্বন করে।' (সুরা মুমিনুন : ১-২)

নামাজ পড়া মানে মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করা। দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়ে থাকে! সে

তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে কেমন হওয়া চাই আমাদের অবস্থা! অবশ্যই ভয়-ভীতি ও মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!' (বুখারি : ৪১৩)। সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে নামাজ আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায় শিখেছিলেন। ঘরে, বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন।

হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। একবার নামাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রা.) একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর আবার নামাজের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে

পারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এ সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!

হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২১৪)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছেÑ হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোনো সঙ্গীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হব না। তখন সে নবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী (সা.) এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে মশগুল হয়ে পড়েন। এমন সময় ওই লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখে চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তার

প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তিনি রুকু সিজদা করে (যথারীতি নামাজ শেষ করে) সঙ্গীকে জাগালেন।

মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাজে) এমন একটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' (আবু দাউদ : ১৯৮)

সাহাবায়ে কেরামের নামাজের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের নামাজ ছিল সত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের নামাজও যেন হয় এমন খুশু-খুজুর অনুভূতিতে পূর্ণ। যারা এমন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন 'সফলকাম ওইসব মুমিন, যারা তাদের নামাজে খুশুখুজু (পূর্ণ মনোযোগ) অবলম্বন করে।' (সুরা মুমিনুন : ১-২)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে,কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেবেন । রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

অর্থঃ "কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে ।" (তিরমিযি)

মহান আল্লাহ মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরজ (আবশ্যক) করেছেন । তা হলো-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা । সালাত একজন মুমিনকে (বিশ্বাসী) মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে । আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ।" (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত কখনোই সালাত ত্যাগ করা যাবে না ।

দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোনো ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদ দেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাত্, ইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও রয়েছে কিছু নিয়মনীতি। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ইমান গ্রহণের পর প্রথম ও প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথাসময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা, পরকালে সব মুসলমানের কাছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁর পরবর্তী সব হিসাব সহজ হয়ে যাবে